Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 241 – 248
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ছড়া-র ইতিহাস : স্বরূপ ও প্রকৃতি

পদ্মিনী চৌধুরী মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক
বালুরঘাট বিএড কলেজ, বালুরঘাট
ইমেইল : chaudhuri.ptm@gmail.com

Keyword
ছড়ার উপকরণ, গঠন, বর্ণ, ছড়ার স্টাইল, ছড়ার ছন্দ, ছড়ার উদ্ভব, পরিবর্তন।

Abstract
আমাদের দেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে যে ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা প্রচলিত আছে, লোকসাহিত্য তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লোকসাহিত্য বলতে মূলত লোক মনস্তত্ত্বকেই বোঝানো হয়। দৈনন্দিন জীবনের কর্মক্লান্তি ঘোচাতে গতরে খেটে খাওয়া নিরক্ষর মানুষ তাদের জীবনের নানান পাওয়া-না পাওয়াকে মুখে মুখে গান, ছড়া ও প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন, এই জাতীয় মৌখিক রচনাকেই সাধারণত লোকসাহিত্য বলা হয়ে থাকে। ছড়ার আদি উৎস লৌকিক। সর্বকালের সাহিত্যের একটি বিশেষ জনপ্রিয় শাখা হল ছড়া। সংস্কৃতির নানা অঙ্গের সঙ্গে 'ছড়া'র সুনিবিড় যোগ রয়েছে। মূলত মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিল যুক্ত ছোট আকারের পদ্যকে 'ছড়া' বলা হয়। এগুলি সাধারণত দুই, চার, ছয়, আট চরণে নির্মিত। এর চেয়ে বড়ো ছড়া খুব বেশি পাওয়া যায় না, কারণ আকারে বড় হলে স্মরণে রাখা সবসময় সম্ভব হয় না। ছড়ার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। অন্নদাশঙ্কর বলেছেন -

> "ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে, নয়তো নয়।"

অর্থাৎ বোঝা যায় তিনি ছড়ার উপকরণ, গঠন, বর্ণ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ছড়ার ব্যুৎপত্তি, ছড়ার ভাষা, ছড়ার কায়া নির্মাণ, ছড়ার ছন্দ ও ছড়ার উদ্ভব ও পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

Discussion
ভূমিকা : 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন,

> "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার - শাস্ত্রের বাহির, মেঘ বিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।"[১]

প্রাচীন লোকসাহিত্যের অন্তরমহলে ছড়ার জন্ম, লালন ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলেও বর্তমান যুগে তা সাহিত্য বা ভাবপ্রকাশের একটি অতি জনপ্রিয়, পরিচিত ও আধুনিক রূপ। এই সময়ে ছড়া লোকসাহিত্যের তথাকথিত ঐতিহ্যের গন্ডি অতিক্রম করে ছেলে ভুলানোর 'মহৎ উদ্দেশ্য' সাধনের গণ্ডিকে ডিঙ্গিয়ে এক নতুন রূপ লাভ করেছে। বহু কবি খুব সচেতন ভাবে শুধুমাত্র ছড়া রচনা করছেন। ছড়ার উৎস খুঁজতে নিলে দেখা যায় যে এর উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা কঠিন; কারণ মৌখিক সাহিত্য সদা পরিবর্তনশীল। ছড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে অনুধাবন করা যায় যে এর সৃষ্টির পেছনে সমষ্টিগত মনের প্রভাব কার্যকর হয়েছে। সমাজের নিতান্ত সাধারণ মানুষদের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে রূপ ধারণ করে, তাই ছড়া।

ছড়ার ব্যুৎপত্তি :

ছড়া শব্দটি অবিভক্ত বঙ্গদেশে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সকল গবেষক শব্দটির মূল উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শ্রী সুকুমার সেন মহাশয়ের নাম সবার প্রথমেই বলতে হয়। সেন মহাশয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক রূপে দুদিক থেকেই 'ছড়া'; শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগগত বিষয়ে বলেছেন –

> "ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা ছত্রাংশ অর্থে ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাই নি। তবে লোক ব্যবহারে এর অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ লোক গদ্য জানত না, 'পদ্য'; শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গলগান, পাঁচালী,যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতাছত্র অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই 'ছড়া'; - শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে - ১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ২) গ্রথিত, গাঁথা- মালা ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্ব। তারপরে অর্থ হলো ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দি 'ফুটকল'; কবিতা আর সংস্কৃত 'চাণক্য'; (চানা ভাজার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম।"[২]

এখানে উল্লেখ্য, উনবিংশ শতকের আগে সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে ডঃ সেন 'ছড়া' শব্দের প্রয়োগ পান নি। এছাড়াও বহু গবেষক এই ছড়া শব্দের মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন, যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' গ্রন্থে 'ছড়া' শব্দটির মূল নির্দেশ করেছেন সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে; সংস্কৃত-ছটা 'প্রাকৃত-ছড়া' প্রা, ম-ছিটা 'ছড়া'। এর অর্থ 'সমূহ, পরম্পরা'। রাজশেখর বসু, যাোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিতের মত এই মতের সমার্থক। অপরদিকে নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'ছড়া' শব্দটি দেশজ। বিভিন্ন অভিধান গ্রন্থে এই শব্দটিকে গ্রাম্য কবিতা অর্থেই বোঝানো হয়েছে। ওয়াকিল আহমদ বলেছেন- 'ছটা' শব্দ থেকে ছড়া শব্দের উৎপত্তি বলে গণ্য করা হয়। অর্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। ছড়ার ভাব বা চিত্র রাশি অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে এরূপ ধারণা থেকে এরূপ নামকরণ হয়েছে। 'ছড়া' সংস্কৃত থেকে আসতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে ছড়া শব্দটির পরিচয় দিয়েছেন এই বলে—

> "বিস্তৃত পদ্য বিশেষ।"[৩]

'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন -

> "ছটা বিশেষ্য, ছন্দে গাঁথা পদ্য কথা, গ্রাম্য কবিতা।"[৪]

ছড়াভাঙ্গা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন- 'ছড়ার অর্থ করা'। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ইন্দুবিকাশ বসু মহাশয় লিখেছেন -

> "ছড়া সম্ভবতঃ 'ছন্দ' শব্দের অপভ্রংশ।"[৫]

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ছড়া' বলতে জানান -

> "কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা।"[৬]

এই সমস্ত আলোচনা থেকে যা বোঝা যায় তা হল —

১. ছড়া শব্দটি বর্তমান লোকসাহিত্যের অন্তর্গত একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে বোঝালেও আভিধানিকরা সবাই সে কথা বলেননি। তাঁরা প্রায় সকলেই ছড়া বলতে গ্রাম্য কবিতাকে বুঝিয়েছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, গ্রাম্য কবিতা মানেই কিন্তু লোকসাহিত্য নয়।

২. বেশ কিছু আভিধানিকগণের মতে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য ও সংগীতের সঙ্গে ছড়ার একটি সুগভীর যোগ ছিল। ছড়া আপনা থেকেই রচিত ও কণ্ঠস্থ হতে পারত অথবা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কোন একটি আসরে এমনিই রচিত হত। বাদানুবাদের জন্য ছড়া ছিল এক অতি জনপ্রিয় ও বহু চর্চিত সাহিত্যিক অস্ত্র।

৩. আধুনিক যুগে ছড়া মেয়েলি বিষয় হয়ে পড়লেও মধ্যযুগে তার ব্যাপকতা ছিল অসীম। সেই সময়ে ছড়ার ব্যবহারে নারী পুরুষ উভয়েই ছিল সিদ্ধহস্ত।

৪. ছড়া রচনা কর্মের মধ্যে একটা সাহিত্যিক নির্মিতিকে স্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায়।

৫. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস উল্লিখিত ছড়াভাঙ্গা পদটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর দ্বারা হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ রচনাকেও তিনি বোঝাতে চাইছেন। সুতরাং ধাঁধা ও হেঁয়ালিও ছড়ার মধ্যেই পড়ে।

৬. নগেন্দ্রনাথ বসু ছড়াকে বলেছেন 'বিস্তৃত পদ্য সাহিত্য'। আমাদের মনে হয় পূর্ব থেকে রচিত ছড়ার আকৃতি একটু বড়ো হয়। আসরে দাঁড়িয়ে রচিত ছড়া স্বভাবতই ছোট হত; কারণ, আকারে বড় হলে বাদানুবাদের প্রকৃত রস খেই হারায়। প্রশ্ন, প্রশ্নের পর উত্তর, আবার প্রশ্ন, আবার উত্তর- এইরকম সংলাপধারার মধ্যে নিহিত থাকতো ছড়ার অস্তিত্ব।

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছড়া'-র পরিচায়ন প্রসঙ্গে বলেন - 'কোন বিষয় নিয়ে রচিত গ্রাম্য কবিতা'। এখানে কোনও আসরের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ আসরের বাইরেও, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যকর্মে বা যেকোন বিষয় নিয়ে যেসকল কবিতা বা পদ্য রচিত হয়, তাও ছড়া। ওপরের বিবিধ প্রয়োগসমূহ থেকে মোট ৪টি শ্রেণীকে ছড়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক. দৈনন্দিন ও গার্হস্থ্য জীবনের নানান ছোটবড় ঘটনা, হাসি কান্না, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে নারীপুরুষের ব্যবহৃত ছড়া।

খ. কোন পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অথবা নিছক অবসর যাপনের জন্য যেকোন বিষয়ে রচিত ছড়া।

গ. কবি - পাঁচালী-তরজা গানের আসরে ব্যবহৃত ছড়া।

ঘ. ব্রত - পার্বনকে কেন্দ্র করে রচিত আনুষ্ঠানিক ছড়া।

সুতরাং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে ছড়াকে বিচার করতে হবে। ছড়া বাঙালির রসবোধ ও শিল্পবোধে সর্বাঙ্গীনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে - তাই ঘুমপাড়ানি গানেও ছড়া, সাপের মন্ত্রেও ছড়া, মঙ্গলকাব্যেও ছড়া, কবি-তরজা গানেও ছড়া, ধাঁধাঁ বলতেও ছড়া। এককথায় বলতে গেলে ছড়া বাঙালি মননের অস্হি ও মজ্জাগত বিষয়, যাকে বাদ দিয়ে জীবন শুরুও হয় না, আবার শেষের পথে রওনাও দেয় না।

ছড়ার ভাষা :

ড: সুকুমার সেন মহাশয় সাধারণ কবিতার সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য বোঝাতে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন,

> "ছড়া কবিতায় লেখকের কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে এবং তাতে রূপের ও ভাবের মধ্যে, ভাষা ও রসের সঙ্গে কোন রীতিসিদ্ধ যোগাযোগ বা সঙ্গতি আবশ্যিক নয়।"[৭]

ছড়া - কবিতার শিল্পীরীতিতে থাকে প্রথমে রূপ ও ভাষা— পরে ভাব ও রস। ছড়ার রূপ ও ভাষা এবং ভাব ও রসের যোগাযোগ আবশ্যিক নয় - কেননা এই যোগাযোগ স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে না করে পরোক্ষ ও অস্পষ্ট ভঙ্গিতে রক্ষা করা হয়। ছড়াতে বিভিন্ন রূপক, প্রতীক এবং সংকেত খুব প্রাধান্য পায়। এর মাধ্যমেই মূলত ছড়ার বক্তব্য প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প কথায় অনেক কথা বলা হয়। গাছ-ফুল-ফল, মানবেতর নানা প্রাণী, মাছ ও পাখি, জল-বৃষ্টি-নদী-পুকুর-দিঘী প্রভৃতি প্রতীকগুলি থেকে চিত্র ময়তা ফুটে ওঠে। প্রতীকগুলি একেকটি ভাব বা বস্তু। তা থেকে আরও একটি ভাব

বা বস্তু ফুটে ওঠে। এভাবে ছড়া প্রসারিত হতে থাকে। ছড়ার মধ্যে এই ভাবে গড়ে ওঠে প্রাণ ময়তা। ছড়ার মধ্যে দেখা যায়, ভরা কলসি ও সাপের উল্লেখ। ভরা কলসি নারী দেহ এবং সাপ পুরুষের প্রতীক। তেমনি গাছ-ফল-মাছ-নদী-ফল প্রভৃতি থাকলে ইঙ্গিত দেয় বিয়ে বা সাধব্যের। ছাতা মানে ঘর, খাট মানে বাড়ি, পালকি মানে পথ। আলতা আর পান থাকলে সধবা নারী, কোথাও ফুলকে খৈ, বুড়িকে কলা গাছ - এইরকম এক একটি অঞ্চলের বা সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কিছু নিজস্ব প্রতীক সংকেত আছে। এইসব প্রতীক সংকেত সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা নেই। আর সেই কারণেই তাদের ভাষা ভঙ্গির মাধ্যমে রচিত রূপটিকে আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। আল্পনায় যেমন একটানে, সংক্ষিপ্ত আকারে অনেকখানি দৃশ্যের সারবত্তা প্রতিফলিত হয়, ছড়ার ভাষাতেও তাই। তাই এখানে দৃশ্যগুলিকে কাটাকাটা, সংযোগ শূণ্য বলে মনে হয়।ছড়ার প্রতিটি পর্বে একটি ভাবময়তা ফুটে ওঠে। তাই কখনো কখনো মনে হয় এক একটি পর্ব বা পংক্তি বা বাক্য যেন এক একটি খন্ড চিত্র হয়ে উঠেছে।

এরপর ছড়ার রসবোধের দিকটি উঠে আসে। অনন্য চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ছেলে ভোলানো ছড়া’ নামক একটি প্রবন্ধে ছড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি চিত্রের মাধ্যমে ছড়ার রসবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি ছড়ার বর্ণ চিত্রের পাশাপাশি ধ্বনি চিত্রের দিকটি অনুধাবন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> “ছড়াগুলি এমন জিনিস যে তাদের যেভাবে সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে-চেড়ে দেখা নানা রকম আলোতে ধরে।”[৮]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছড়া যেন ক্যালিডোস্কোপ (Kaleidoscope)। এর অর্থ এক ধরনের চোঙাকৃতি খেলনা যার ভিতর অনেক রং এর কাচ ও আয়না থাকে এবং যা ঘোরালে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বর্ণ ও নকশা দেখা যায়। বিশ্লেষণে বলা যায়, ছড়ার মধ্যে যে বিভিন্ন পংক্তি বা বাক্য থাকে তা যেন একটি রস বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। লোক সাহিত্যের বিষয়গুলির মধ্যে ছড়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন,

> “আমাদের ভাষা ও সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলোর বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেটি আমার নিকট অধিক আদরনীয় বোধ হইয়াছিল।”[৯]

ছড়ার ভাষা ও ব্যাকরণগত বিশেষত্ব গুলি নিম্নরূপ—

১. নাম শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিকৃতি সাধন। যেমন, কানছ > কাঁদছ, আয় রে চাঁদা

২. কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাব্যিক ব্যবহার।

৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দের নানা বিচিত্র ব্যবহার। যেমন, ‘ইকরি মিকরি চাম চিকরি’।

৪. পদাশ্রিত নির্দেশক এর বিশিষ্টতা। যেমন, লাল নাটিখান। ভাতটি খেলে পেটটি সোজা।

৫. শব্দদ্বৈত, প্রতিধ্বনি শব্দ, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের ব্যাপক ব্যবহার। যেমন, ‘মাছ ধরেছি চুনোচানা’। ‘মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি’; (‘মা- বাবা, সহচর শব্দ‘; বড় শাঁখাটি, ছোট শাঁখাটি ঝামুর ঝুমুর করে’। (বড়- ছোট, প্রতিচর শব্দ)

৬. কারক বিভক্তির ব্যবহারে অস্থিরতা। যেমন, বনকে যাব।

৭. অনুসর্গ পদের বিশিষ্ট ব্যবহার। যেমন, জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে।

৮. অসমাপিকা ও নিমিতার্থক অসমাপিকার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

৯. নামধাতুর প্রয়োগ বৈচিত্র্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দকে নামধাতু রূপে ব্যবহার। যেমন, ঝমঝমাইয়া টাকা পড়ে।

১০. কতকগুলি অব্যয় পদের বিশিষ্ট ব্যবহার।

১১. বাক্য ও বাকাংশের বিশিষ্ট ব্যবহার। যেমন, কোন সোহাগের বউ।

১২. বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দের ব্যবহার। যেমন, তিরস্কার, গালাগালি, ব্যঙ্গবিদ্রুপমূলক উক্তি প্রভৃতি। যেমন, গুণবতী ভাই আমার।

১৩. প্রসারিত ও নবাগত অর্থে শব্দের ব্যবহার।

১৪. প্রশ্নবোধক ও সম্বোধনাত্মক উক্তি।

১৫. বাক্য গঠনে Antithesis-এর প্রভাব। এখানে 'একটি' বা 'এক' শব্দ দিয়ে বাক্যের দুইটি অর্ধ রচনা করা হয়। এর মাধ্যমে উভয় বাক্যকে একটি নিবিড় বন্ধনে বাঁধা হয় অর্থাৎ দুই অর্ধের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়। যেমন, 'একটা নিলে কিঁয়ের মা, একটা নিলে কিঁয়ে'।

১৬. ক্রিয়া পদের দ্বারাও প্রতিসাম্য গড়ে ওঠে। যেমন, 'বট আছেন, পাকুর আছেন, তুলসী আছেন পাটে'।

১৭. উপমার বিশিষ্টতা। যেমন, 'কলা বউয়ের মত লজ্জাশীলা হব, দূর্বার মতো লতিয়ে যাব'।

১৮. বিভিন্ন ব্যক্তি-বস্তু-দেশ-প্রাণীর নামকরণ তত্ত্ব নিয়ে সবিশেষ আলোচনা।

১৯. অবিকৃতভাবে একই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির ফলে একটা প্রতিসাম্য গড়ে ওঠে। যেমন, 'শিল শিলাটন/শিলে বাটন/শিল অঝঝর ঝরে'।

২০. বাগভঙ্গি, আতিশয্যমূলক উক্তি, বিশেষ স্থানের নাম, কথ্য ও মেয়েলি ভাষাভঙ্গি প্রভৃতি ছড়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, আঁধার ঘরের মানিক।

২১. ছড়ার ভাষায় ধ্বনি ও দেহভঙ্গির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'পায়ে আলতা মুখে পান, পাটবস্ত্র পরিধান'। 'না কান্দিস না কান্দিস দাদা, গামছা মুখত দিয়া'।

অর্থাৎ ছড়ার ভাষা মূলত কথ্যভাষা ভঙ্গিকেই আশ্রয় করে থাকে এবং চলমান জীবনের সঙ্গে ছন্দ সংগতি রেখে তা পাল্টে যায় সহজেই। ছড়ার ভাষা মানুষের মুখের ভাষা। তাই মনে করা হয়, এখানে কিছুটা হলেও উপভাষার প্রয়োগ থাকবেই। যেহেতু নির্দিষ্ট করে এখনো উপভাষা নিয়ে আলোচনা হয়ে ওঠেনি, তাই ছড়ার ভাষাগুলি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের তা বলা শক্ত। ছড়ার ভাষার যে ভঙ্গি তা মূলত লোকভাষা। উপভাষা মূল ভাষার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষা করে চলে কিন্তু লোক ভাষা লোকমনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলেন।

ছড়ার কায়া নির্মাণ :

ছড়ার কায়া নির্মাণের ক্ষেত্রে ছড়ায় অন্ত্যমিলের ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়। এ মিল একটি 'Objective' রূপ নির্মিতির দিক নির্দেশ করে। এই রূপ নির্মিতি ছড়ার স্টাইল। এই মিলবিন্যাস নিছক খেয়াল খুশিতে ভরা নয়। শব্দে শব্দে মিল রচনা করতে করতে ছড়ার কায়া বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই বৃদ্ধিকরণ নিতান্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, শেষের একটি লক্ষ্য আছে। সব ছড়ারই শেষটুকুই বিশেষত্ব। ছড়ার শেষাংশই হল ছড়ার 'Climax', সমাপ্তির সুসম্পূর্ণতা, কোন বিশেষ চরিত্রের, দৃশ্যের, ঘটনার, পরিস্থিতির পরিপূর্ণতা, কোনো ধন্যাত্মক শব্দের বা শব্দদ্বৈতর বিশিষ্ট প্রয়োগ, অনুরোধ-অনুজ্ঞা-প্রতিজ্ঞাসূচক কোন মনোভাব প্রভৃতি যতক্ষণ না এসে পৌঁছায়, তাকেই লক্ষ্য করে ছড়া বাড়তে বাএগোতে থাকে। ছড়ার কায়া নির্মাণে এই শেষাংশের একটি অসামান্য ভূমিকা আছে। ছড়া এমনভাবে বাড়ে যে, একটি রসময় পরিণতি তার থাকেই, সে পরিণতি না এসে পড়া পর্যন্ত ছড়া বাড়তে থাকে। যেমন করেই হোক মিল বা সাম্য সৃষ্টি করায় বাংলা ছড়ার বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমেই ছড়ার মূল নিহিত থাকে, যা লোকমনস্তত্ত্বের অর্থাৎ মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রস্ফুটিত করে।কোন একটি দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্র ও পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদানের প্রবণতাও ছড়ার কায়া গঠনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাববস্তুর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। এরই ফলে এক একটি ছড়া একাধিক খন্ড চিত্রের সমষ্টি হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সকলেই ছড়ার অন্তর্ভুক্ত এই খন্ড চিত্রের শোভাযাত্রা সমারোহের কথা বলেছেন। শুধুমাত্র অন্ত্যমিল এবং অন্যান্য মধ্যমিলকে অবলম্বন করেই ছড়ার কায়া নির্মিত হয় না। আরও নানা ভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে সেটি হল প্রশ্নোত্তর- মূলকতা। যেমন,

"পুটু নাচে কোন খানে? / শতদলের মাঝখানে / সেখানে পুটু কি করে? / চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে।"[১০]

আহ্বান ও সম্মোধনমূলকতাও ছড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। টুকরো টুকরো কাহিনী কণা, খন্ড চরিত্রের ঘন ঘন আনাগোনা, দৃশ্য ঘটনার ক্ষণিক আকস্মিক চমক দেওয়া হয় এ কাহিনি গুলির মধ্য দিয়ে। যেমন, 'খোকা যাবে নায়ে' এখানে বণিকের চিত্র ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগীয় কাব্য সংস্কার, রাধা কৃষ্ণ, হরগৌরী, রাম সীতার প্রসঙ্গ বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। রূপকথাধর্মিতা ছড়ার কায়া গঠনের ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া খাঁটি লৌকিক ও বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত বিভিন্ন চিত্র, চরিত্র ও পরিস্থিতি এখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ধোপা-নাপিত, ডোম-বাগদি, বুড়ো-বুড়ি প্রভৃতি।এতে বাস্তবের সাথে কল্পনা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। নানা ধরনের স্থান, নাম খুঁজে পাওয়া যায়, যাদের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। এই কল্পজগতের মাঠ-ঘাট-নদী-বনগুলি শিশুর মনকে এক ধরনের নিজস্ব পরিমন্ডলের মধ্যে পৌঁছে দেয়। 'ক্ষীরনদীর কূল'; 'হট্টমালার দেশ', 'তিনপূর্নির ঘাট', 'হরগৌরীর মাঠ'- এদের মধ্যে কোনটি যে বাস্তব আর কোনটি কল্পনা তা নির্ণয় করা খুব দুরুহ।

ছড়ার ছন্দ :

বাংলা ছড়ায় ছন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছড়ার বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখলে ছড়ার একটি বিশেষ ছন্দ ফুটে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ছন্দকে বোঝাতে আমরা ছড়ার ছন্দ বলে থাকি। ছড়ার অন্তরঙ্গের সৌন্দর্য বা ভাবকে বুঝতে হলে শুধুমাত্র একটি ছন্দকে বা তালকে অনুসরণ করা চলে না, সেখানে গীতিধর্মিতা বা সুর অনেকটা প্রভাব ফেলে। সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে, ছড়ার ছন্দে একটা দ্রুততা রয়েছে আর সেই দ্রুততার কারণে ছড়ার ছন্দ শ্বাসাঘাত প্রধান হয়ে থাকে। এই ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে একটি করে শ্বাসাঘাত পড়ে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, 'পালকি চলে / পালকি চলে / গগন তলে / আগুন জ্বলে'। ছড়া কখনো আবৃত্তি করা হয়, কখনো গাওয়া হয়, আবার গান বা আবৃত্তির মাঝামাঝি একটা কিছু করা হয়। যে ছড়া আমরা আবৃত্তি করি, তাতে তাল রক্ষার বাধ্যবাধকতা নেই, কারণ তা আবৃত্তিকারীর ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে। তাই তাল ও ছন্দ বজায় রাখার প্রয়াস গৌন হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন ব্রতের ছড়া যখন একসাথে বা এককভাবে হালকা সুরে গাওয়া হয় বা আবৃত্তি করা হয়, তখন তাল, ছন্দ রক্ষা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবৃত্তিমূলক ছড়াতে শাসাঘাত প্রধান ছন্দ গৌণ কিন্তু গেয় ছড়াতে তা মুখ্য হয়ে ওঠে। মন্ত্রের ছড়াগুলি কখনো এত দ্রুত উচ্চারিত হয় যে সেখানে সুর-তাল-ছন্দ-শ্বাসাঘাত এর কোন স্থান থাকে না। কখনো ঘুমপাড়ানি গানের ছড়াতেও শ্বাসাঘাত পরিলক্ষিত হয় না, কারণটা ঘুমের জন্য তা অনুকূল নয়। কোথাও দেখা যায়, একই ছড়ার ভেতরে কোন কোন অংশে দলবৃত্ত ছন্দের প্রাধান্য থাকে, কোন অংশে কলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের প্রাধান্য থাকে। কিছু কিছু ব্রতের ছড়াতে শ্বাসাঘাতের প্রভাব নজরে এলেও, যখন কণ্ঠে উচ্চারিত বা সুর দেওয়া হয় তখন এই শ্বাসাঘাতের বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত শেষ পঙ্ক্তিতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গা জলে'। এটি সাধারণ গদ্যের মতোই উচ্চারিত হয়। আসলে ছড়ার মূল উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। তাই সুরের বিশিষ্টতা জানিয়ে দেয় ছড়া শেষ হতে চলেছে। তাই দ্রুত শ্বাসাঘাত নয়, মধ্যলয়ের মধ্য দিয়ে ছড়ার পংক্তি গুলির ভাব ফুটে ওঠে। ছড়া মানেই যে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ও তানপ্রধান ছন্দের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটে থাকে। যেমন,

"আমার টুসু মুড়ি ভাজে,
চুরি ঝমঝম করে গো,
উয়ার টুসু হতভাগী আঁচল পেতে মাগে গো।"[১১]

এ কথা আমরা বলতে পারি ছড়ার ছন্দের নির্দিষ্ট কোন লয় নেই, নির্দিষ্ট কোন ছন্দ নেই, ছড়ার পর্ব-মাত্রার উপর নির্ভর করে বা বিশেষ ধরনের শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে ছড়ার ছন্দ নির্বাচিত হয়।

ছড়ার উদ্ভব ও পরিবর্তন :

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নতুন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সে অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূর এবং মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলোও শিশু- সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে...।"[১২]

কবি শিশু বলতে শুধুমাত্র শিশুকেই বোঝান নি, বয়স্ক মানুষের এক বিশেষ দিক কেউ তিনি নির্বাচন করেছেন। কবি তার নিজের শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শিশু বলতে আমরা আদিম মানব গোষ্ঠীর সারল্যকে বুঝি। এক দেশের শিশুর সঙ্গে যেমন আরেক দেশের শিশুর কোন অমিল নেই, তেমনি এক অংশের আদিম মানুষের সঙ্গে অপর অংশের আদিম মানুষেরও নিবিড় যোগ রয়েছে। সেই দিক থেকে শিশু ও আদিম মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিশুর মত সরলতা ও জিজ্ঞাসু মন যাদের আছে, তাদের দ্বারাই মূলত ছড়া উদ্ভূত হয়েছে। ছড়ার মধ্যে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের মনস্তত্ত্ব। যা সাধারণ শিশুর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

সমসাময়িক কালে ছড়া বিশেষ রচিত হয় না। ছড়া পূর্ববর্তী কাল থেকে চলে আসে তা সময়োপযোগী করে কিছু কিছু বাইরের দিক থেকে পরিবর্তিত করে নিতে হয়। এ পরিবর্তনেও অন্তর্ভুক্ত রস অব্যাহত থাকে। এই পরিবর্তনশীলতার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কামরূপধারিতা' ও 'কামচারিতা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। এই শব্দ দুটির 'কাম' শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা। ব্যাপারটি ছড়ার মধ্যে কখনো প্রত্যক্ষ ও কখনও পরোক্ষভাবে কাজ করে। এ বিষয়টি তিনি বুঝিয়েছেন এভাবে, রূপান্তর বলতে আমরা বুঝি এক রূপ থেকে আরেক রূপে চলে যাওয়া বা অন্য আরেক রূপ ধারণ এবং সেটা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুযায়ী। যেমন, ইন্দ্রের ইচ্ছে ছিল ঋষি পত্নী অহল্যার দেহসম্ভোগ করা কিন্তু অহল্যা ধর্মপরায়না সতী নারী। এমন ব্যভিচার সে প্রশ্রয় দেবে না। কাজেই ইন্দ্র অহল্যার পতী রূপ ধারণ করল। এই যে ইন্দ্র ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যের রূপ ধারণ করল এটাই হল কামচারিতা বা কামরূপধারিতা। এই ধারণাটির সঙ্গে স্বাভাবিক রূপান্তরের বেশ একটা তফাৎ আছে। যেমন, ছিল ব্যাঙাচি হয়ে গেল ব্যাঙ কিংবা ছিল শুয়োপোকা হয়ে গেল প্রজাপতি। এটি স্বাভাবিক রূপান্তর। শুয়োপোকা কখনো ব্যাঙ হতে পারবে না আবার ব্যাঙ কখনও প্রজাপতি হতে পারবেনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবে স্থান কাল পাত্র বা পরিবেশ গত দিক দিয়ে ছড়ার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া অর্থাৎ রূপ পরিবর্তনের দিকটি বোঝাতে চেয়েছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একটি ছড়া তে দেখা যায় –

"খুকুমণির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে।"[১৩]

কিন্তু পূর্ব বাংলায় এক গ্রাম থেকে এরই একটি নতুন রূপ সংগ্রাহকদের হাতে এসেছে। সেখানে ছড়াটি হল –

"নারগিসকে বিয়া দিব উজানতলির দেশে।"[১৪]

কাঠামোটি অবিকৃত রেখে স্থান ভেদে পছন্দসই কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে রসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন কেউ সচেতন ভাবে করে না, আপনি এটি পরিবর্তিত হয়। সেই জন্য কোন সচেতন মন যখন ছড়া পরিবর্তন করে প্রয়োজন সাধন করতে উদ্যোগী হয় তখন তাতে রস যেমন থাকে না তেমনি সৌন্দর্যও ফুটে ওঠে না। দেশান্তরে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্য সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায় কিন্তু কো্ন ছড়া যে কখন কোথায় প্রথম উদ্ভূত হয়, তা নিরূপণ করা কঠিন।

অবশেষে বলা যেতে পারে, ছড়ার রচনাভঙ্গি গান–কথা–ধাঁধা–প্রবাদ-লোকনাট্যে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি মধ্যযুগের নানা রচনাতেও তার প্রকাশ রয়েছে। এমনকি আধুনিক সাহিত্যেও ছড়াকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি দিক ব্যক্ত হয়ে ওঠে ছড়ার মাধ্যমে। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন বিষয় ছড়ার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাই সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ছড়াকে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত করা হলেও, ছড়ার ব্যাপকতার দিকটি অস্বীকার করা যায় না। বাঙালির জাতীয় জীবন, মানুষের রুচি, প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষার জন্য ছড়ার ভূমিকা অপরিসীম।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, যূথিকা বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১০০৯

২. ভৌমিক ড. নির্মলেন্দু, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ,রাজলক্ষী প্রেস, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৬, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা, পৃ. ৫

৩. তদৈব, পৃ. ১

৪. তদৈব, পৃ. ১

৫. তদৈব, পৃ. ২

৬. তদৈব, পৃ. ২

৭. তদৈব, পৃ. ২৭

৮. চক্রবর্তী বরুণকুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৪

৯. ১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, যূথিকা বুক স্টল,প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৯৮৯

১০. ভৌমিক ড. নির্মলেন্দু, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ,রাজলক্ষী প্রেস, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৬, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা, পৃ. ৭১

১১. চক্রবর্তী বরুণকুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৫

১২. সিদ্দিক ড. আশরফ, ১ম খণ্ড, লোক সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ,প্রথম সংস্করণ, ২০১২,কলকাতা, পৃ. ১৬৮

১৩. নন্দী ড. রতনকুমার, বিষয় লোকসংস্কৃতি, সাহিত্যশ্রী, প্রথম প্রকাশ, ১৫ জুলাই ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৫

১৪. তদেব